অতিথিসেবা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

[লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমায় যেসব ঘটনা বা চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'আমার দেশ, আমার স্বজন' শীর্ষক কাহিনিগুলির মধ্যে। প্রবল পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে যে সমাজ তার সামনে আলোকবর্তিকার মতো তুলে ধরা হয়েছে সনাতন ভারতের স্বরূপ। সত্যের আধারে কাহিনিগুলি পরিবেশিত হলেও সাহিত্যিকের সরস উপস্থাপনাকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। জীবনের শিক্ষা ও পাঠের স্বাদুতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অশীতিপর সাহিত্যিকের এই মর্মস্পর্শী রচনাগুলিতে। আশা করি, নিবোধত-র পাঠকগোষ্ঠীর কাছে লেখাগুলি সমাদর লাভ করবে।]

কানায় কানায় পূর্ণ 'কলামণ্ডলমে'র প্রেক্ষাগৃহ। ঋতুরাজ বসন্তের পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত সুদর্শন মঞ্চটি। মুকুলিত আম্রতরুর একটি ডাল ঢুকে পড়েছে সাইড উইং-এর পাশ দিয়ে পশ্চাৎপট ছুঁয়ে। ডালে বসে একটি কালো কোকিল। যন্ত্রচালিত কোকিলটি বারবার ডাক দিচ্ছে তার সঙ্গিনীকে। একঝাঁক ভ্রমর উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে চলে গেল।

মঞ্চের ডানদিকের পাদপীঠে মাজা পেতলের একটি কলস। সাদা, হলুদ আর গৈরিক রঙে চক্রাকার একটি আলপনা কলসটিকে বেষ্টন করে আছে। কলস থেকে উঠেছে পলাশের একটি ডাল। কালো ডালে প্রদীপের মতো জ্বলছে লাল হলুদ ফুলগুলি।

পূর্ণ পশ্চাৎপটে তুষারশুভ্র কৈলাসের শৃঙ্গটি দেখা যাচ্ছে। তারই তলায় একটি শিলাস্তূপে বসে রয়েছেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি। ভেসে এল নন্দিত নূপুরের শব্দ। মঞ্চে প্রবেশ করলেন বসন্তপুষ্পাভরণে ভূষিতা পার্বতী। কোকিলের ডাকে, মধুকরের গুঞ্জনে সারা মঞ্চ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। শুরু হল নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমার লীলানৃত্য। নানা বিভঙ্গে নানা মুদ্রায় সে নাচ বিহ্বল করে তুলল উপবিষ্ট দর্শকদের।

অর্ধনিমীলিত নয়নে ধ্যানমগ্ন শংকরের ভূমিকায় বসে রয়েছে কলামণ্ডলমের শ্রেষ্ঠ ছাত্র দেবন। তার উদ্দেশে পার্বতীর ভূমিকায় নৃত্য নিবেদন করছে প্রেমা মেনন। দুজনেই কলামণ্ডলমের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

চিত্তহারী নৃত্য, সুশোভন অঙ্গসজ্জা, হৃদয়গ্রাহী করচরণবিন্যাস, নয়নবিভঙ্গ দর্শকদের হৃদয়হরণ করলেও মহাতাপস শংকরের ধ্যানভঙ্গ করতে পারল না। সহসা উইংসের আড়াল থেকে দেখা গেল পুষ্পধনুর উষ্ণীষ। কামদেব মদন শিবের বক্ষ লক্ষ করে নিক্ষেপ করলেন পুষ্পশর। কেঁপে উঠল কৈলাস, ধ্যানভঙ্গ হল মহাদেবের। ললাটে ঝলসে উঠল অগ্নি, ভস্মীভূত হলেন পুষ্পধনু। 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী'—নিজের রূপকে মনে মনে নিন্দা করলেন পার্বতী। কী অপূর্ব সলজ্জ ভঙ্গিতে নিজেকে ধিক্কার দিলেন শৈলসুতা! দীর্ঘ দুঘণ্টা ধরে কলামণ্ডলম্ প্রেক্ষামঞ্চে অভিনীত হল কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্'।

যবনিকাপাত হলে করতালধ্বনিতে কতক্ষণ মুখরিত হয়ে রইল প্রেক্ষাগৃহ! সামনের দর্শকাসনে বসেছিলাম আমি। কেরালার পটভূমিতে একটি উপন্যাস রচনা করব জানতে পেরে নানাভাবে আমায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কেরালাবাসিনী দুটি ভগিনী—প্রেমা মেনন আর তার বোন সরিতা।

কোটিপতি শ্রীহর্ষ মেননের দুই কন্যা তারা। কিছুকাল আগে নিউইয়র্ক যাত্রার সময় প্লেনক্র্যাশে মৃত্যু হয় তাঁর। বিপত্নীক মানুষটি দুই কন্যা আর বিপুল সম্পত্তি রেখে অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। কোভালমের সমুদ্রসৈকতে একটি বিলাসবহুল হোটেলের মালিক ছিলেন তিনি। তাঁর কন্যারা সেই হোটেল পরিচালনার কাজে নিযুক্ত। সরিতা হোটেল দেখাশোনা করে কিন্তু প্রেমার বেশির ভাগ সময় কাটে কলামণ্ডলমে। সে এখন নৃত্যশিল্পে কেরালার উদীয়মান নক্ষত্র। আমার সৌভাগ্য, এরনাকুলমে এই দুই বোনের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল 'কবিতা' সিনেমাহলের ম্যানেজার হারিশ নামের এক মুসলমান যুবক।

গ্রিনরুমে ঢুকেছিল সরিতা দিদির সঙ্গে দেখা করতে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম তার নির্দেশমতো হলের বাইরে দরজার কাছে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। একে একে দর্শকেরা চলে গেল কলরব করতে করতে। কিছু পর দুবোনকে দেখতে পেলাম করিডোর দিয়ে বেরিয়ে আসতে। প্রেমা সস্মিতমুখে দূর থেকে আমাকে নমস্কার করল। আমি দুহাত জোড় করে, সোচ্ছ্বাসে বললাম, 'অসাধারণ!' কাছে এসে প্রেমা বলল, ''রোদের রং পালটেছে, দিনান্তের বাকি নেই, সরিতার সঙ্গে আপনি হোটেলে চলে যান। আমি আজ এখানেই থাকব।" সরিতার দিকে ফিরে বলল, ''র‍্যাশ ড্রাইভ করবি না। পথের ধারে ভালো রেস্তোঁরায় প্রফেসরকে কফি স্ন্যাকস খাইয়ে নিবি। আশা করি নটার ভেতর হোটেলে পৌঁছে যেতে পারবি।" গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল প্রেমা। সরিতা বসল চালকের আসনে।

প্রেমা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ''ক্ষেপে না গেলে আমার বোনটির হাত বেশ ভালো, আপনি নির্ভয়ে যেতে পারেন।"

আমি সরিতার পাশেই বসলাম। গাড়ি ছুটল কোভালমের দিকে। পিচঢালা পথ, দূরে বাঁদিকে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে পাহাড়, ডানদিকে নারকেল গাছের শ্যামলিমা। ওরা বলে, 'তেঙ্গা তপ্‌পম্'। কেরলের অর্থনীতির বিরাট উৎস এই নারকেলবীথি। ব্যবসায়ে নারকেলের কোনও কিছুই ফেলা যায় না। কয়ার ইন্ডাস্ট্রি কেরলের প্রায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে যে নদীগুলি কেরলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছে তাদের শাখা দিয়ে উপচে পড়া কিছু জল সৃষ্টি করেছে কায়েলের। কায়েলেও নৌকা চলে। প্রধানত কায়েলের জলে ডাবের খোলা কেটে কেটে ফেলে সেগুলি বাঁশ পুঁতে জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। কয়েকদিনের মধ্যে ছোবড়াগুলি পচে যায়। তাই কায়েলের জল সাধারণত কালো হয়ে ওঠে। পরে নারকেলের পচা খোসাগুলি তুলে পিটিয়ে আঁশ বের করতে হয়। যন্ত্রে ফেলে ওই আঁশ থেকেই দড়ি তৈরি হয়। দড়ি থেকে আবার তৈরি হয় নানারকম দ্রব্য।

গাড়ি ছুটেছে, আর বিবরণ দিয়ে চলেছে সরিতা। একটু দূরে ডানদিকে আরবসাগরের নীল ছুঁয়ে আছে দেশটাকে। সোনালি বালুর তীর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে জায়গায় জায়গায় পাথর ছড়ানো। ঠিক তারপরই নারকেল গাছের সারি। পাশ দিয়ে বইছে কায়েলের কালো জল। সোনালি বালির জমিনে কালো নৌকাগুলো বিশ্রাম নেয় সারাদিন সমুদ্রের রুপোলি সম্ভার ডাঙায় তোলার পর। নারকেলবীথির ফাঁকে ফাঁকে জেলেদের চালাঘর। তাদের অনেকেই রাতে শোয় বালুবেলায় অথবা নৌকায়। সমুদ্র আর নারকেলপাতার গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।

হাওয়া বয়, শরীর জুড়িয়ে যায়। সাদা গাড়িটাকে বেলাভূমিতে রেখে আমি আর সরিতা কতক্ষণ জ্যোৎস্নালোকে ঘুরে বেড়ালাম। আমার মনে হচ্ছিল নাচের দেশ কেরালা ভারতনাট্যম, কথাকলি, দাসীআট্টম্, মোহিনীআট্টম্, কৈকটিকলি প্রভৃতি অসাধারণ নাচগুলির স্রষ্টা। কেরালার প্রকৃতিই তার নরনারীর ভেতর এনে দিয়েছে বিচিত্র নৃত্যের ছন্দ।

সাগরতরঙ্গে ভেসে চলেছে পালতোলা নৌকাগুলি। সাদা সাদা তেরেমালা পাখিরা হাওয়ায় ডানা ভাসিয়ে দিয়ে নাচের ছন্দে ওঠানামা করছে জলের ওপর। সাগরের হাওয়ায় দুলছে সকাণ্ড নারকেলগাছের সারি। যেন নাচের মুদ্রায় দুলে চলছে নর্তকীরা। দুবাহু প্রসারিত করে তারা নিজেদের মেলে ধরছে। জ্যোৎস্নার আলো মসৃণ পাতায় ঝিলিক দিয়ে

ঝরে পড়ছে কায়েলের জলে। ভাল্লম্ এগিয়ে চলেছে স্রোতের টানে নৃত্যরত কোনও মীনের মতো।

একসময় দেখতে পেলাম, কয়েকটি ধীবর সপরিবারে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এগিয়ে গেল সরিতা। নিজেদের ভাষায় কিছুক্ষণ ভাবের আদানপ্রদান হল তাদের। একসময় আমার দিকে ফিরে সরিতা বলল, ''আমাদের সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াতে দেখে ওরা ওদের নারকেলপাতায় ছাওয়া 'কুডিল' (কুটির) থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমাদের নিয়ে যেতে চায় ওদের ঘরে। যেহেতু আমরা মেয়েপুরুষ একসঙ্গে ঘুরছি, সেজন্য ওরা মেয়েপুরুষে মিলে এসেছে আমাদের নেমন্তন্ন করতে।''

ওদের এই রীতিটুকু আমার বেশ ভালো লাগল। স্বাভাবিক সৌজন্যে ভরা এই আহ্বান। আমরা একটা বালির ঢিবির ওপর উঠে গেলাম। দু-তিনটে নারকেল গাছ দুলছিল হাওয়ায়। সেখানে নারকেলপাতা আর বাঁশ দিয়ে ঘর বানিয়েছে ওরা। এখন নারকেলপাতায় বোনা চাটাই বিছিয়ে দিল। আমরা বসলাম। কয়েকটি জেলে পরিবার আমাদের ঘিরে বসল। মধ্যবয়সী একটি লোক সরিতাকে চিনতে পেরে বলল, ''কয়েকবছর আগে দিদিমণি তুমি এসেছিলে আমাদের এই পল্লিতে। তোমার সঙ্গে অনেকেই ছিলেন। একটা ফিল্ম তোলার কাজে তোমরা এসেছিলে। আমাদের জীবন নিয়ে ছবিটা তৈরি হয়েছিল। সে ছবি সে বছর শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের সম্মান পেয়েছিল।'' সরিতা বলল, ''সে ছবির নাম দেওয়া হয়েছিল 'চেমিন'।''

ধীবরপল্লির মেয়েরা চা তৈরি করে খাওয়ার জন্য সরিতার কাছে সব সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হল। চা, দুধ, চিনি, কেটলি, স্টোভ সবকিছু হাতের কাছে, কিন্তু করে নিতে হবে অতিথিদের। সরিতা হেসে বলল, ''রোজ তো হোটেলের বেয়ারা, বাবুর্চির হাতে চা খেতে হয়, আজ না হয় তোমরাই বানিয়ে দিলে!''

সরিতার কথায় মনে হল ওরা দারুণ খুশি হয়েছে।

চা তৈরি চলল, কাপ প্লেট বিস্কুট সবই এসে গেল। ওদের মধ্যে কয়েকজন মুরুব্বি চায়ের আসরে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। মধ্যবয়সী একটি মেয়ে সসংকোচে বলল, ''আজ ভালো চিংড়ি উঠেছে, কয়েক প্লেট ভেজে এনে দেব? পমফ্রেটও আছে।''

সরিতা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''আপত্তি নেই তো?'' বললাম, ''এদের এই সাদর আপ্যায়ন উপেক্ষা করব সাধ্য কী?'' এই সরল মানুষগুলির ভেতর বসে আমার মনে হচ্ছিল, আমি সত্যিকারের ভারতবর্ষের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারছি।

আলোচনাপ্রসঙ্গে উঠল 'ওনম' উৎসবের কথা। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ঘরে ঘরে উঠে যায় পাকা ফসল। কেরালাবাসীর হৃদয় ভরে ওঠে উৎসবের আনন্দে। বিদেশে কর্মরত কেরালাবাসীরা সেসময় ঘরে ফেরে। পুজোয় বাঙালিরা যেমন নতুন পোশাক পরে, তেমনি ওনম উৎসবেও এরা নতুন পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে তোলে।

উৎসবের সব-সেরা অনুষ্ঠান বোট-রেস। সবাই তা দেখতে ছোটে আলেপ্পিতে। জল কেটে তীরের গতিতে ছুটে চলে একসারি 'চুন্ডন ভাল্লম্'। শত শত দাঁড়ের ঘায়ে কায়েলের জল কাচের ভাঙা টুকরোর মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আশি থেকে একশ বিশ ফুট অবধি লম্বা নৌকাগুলো সাপের মতো হিলহিল করে এগিয়ে চলে। প্রায় পঞ্চাশজন দাঁড়ি তালে তালে দাঁড় টানতে থাকে। নৌকার পেছনে উঁচু হয়ে জেগে থাকে চোদ্দো ফুট 'আমরণ'। তাকে সাজানো হয় মালা আর কাপড় দিয়ে। নিচে বিরাট ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে গায়ক করে চলে ওয়াঞ্জিপাঠ। সেই সুরে আর সেই তালে দাঁড়িরা দাঁড় টেনে চলে।

এ উৎসব দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সহজ সরল অনাড়ম্বর একটা জীবনের ছবি আমি ওই ওয়াঞ্জিপাঠের ভেতর দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম। গানের কথায় তরুণী বউটি তার স্বামীকে বলছে, ''এমন সোনার ফসল ফলেছে, আমায় কিছু দেবে না? একটা সুন্দর বাক্স, একটা শাড়ি, আর বর্ষার দুরন্তপনা থেকে বাঁচার জন্য একটা ছাতা—দেবে না এইটুকু?'' উৎসবের দিনে কোনও বিলাসদ্রব্য চাইছে না মেয়েটি তার আপনজনের কাছে, প্রয়োজনের সামান্য জিনিসটুকুই চাইছে।

কেরালায় ঘুরে ঘুরে ওদের পুষ্পপ্রীতি, সহজসুন্দর জীবনযাপন আমি বিশেষভাবে লক্ষ করে মুগ্ধ

হয়েছিলাম। পথের ধারে একটা মণ্ডপসজ্জা দেখে একসময় ঢুকে পড়েছিলাম। মাটি দিয়ে তৈরি উঁচু মণ্ডপটির চারিদিকে বাঁশের খুঁটি আর ওপরে চাঁদোয়া দিয়ে ফুলের সাজে সাজিয়েছে। ফুল আর পাতার এ এক আশ্চর্য মণ্ডনশিল্প! আমার উদ্দেশ্য বুঝে গৃহকর্তা সাদরে আমাকে ঘরের ভেতর আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি মেয়েরা যেখানে ফুলের সাজে কনেকে সাজাচ্ছিল সেখানেও আমাকে নিয়ে গিয়ে সব দেখালেন। এমন উন্মুক্ত মনের শিল্পপ্রিয় জাত আমি খুব কম দেখেছি।

সেদিন জ্যোৎস্নার আলোধোয়া নারকেলবীথির তলায় বসে ধীবরদের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। অবশ্য ইন্টারপ্রেটার ছিল সরিতা। কথাপ্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রকম নৌকো এবং তার ব্যবহারবিধির কথা। মনে হল ওরা বিশেষ আগ্রহভরে আমার বর্ণনা উপভোগ করেছে।

এতক্ষণ মনে ছিল না আমাদের কোভালমে ফিরতে হবে! ঘড়িতে তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা দ্রুত পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। দক্ষ ড্রাইভারের মতো পিচঢালা পথে গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে চলল সরিতা।

হঠাৎ পথের ধারে গাড়ি থামিয়ে বলল, ''এখান থেকে কোভালমে পৌঁছাতে এখনও আড়াই ঘণ্টা মতো লাগবে। চাঁদের আলোও ম্লান হয়ে আসছে। তোমার কাছে একটা প্রস্তাব রাখছি, বাঁদিকে যে রাস্তাটা দেখছ এটা চলে গেছে একটা গাঁয়ের ভেতর। ওখানে আমার এক বান্ধবীর বাড়ি। সে এখন তার স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে ছোটো মেয়েটিকে নিয়ে দাদুর সঙ্গে আছে। একসময় ওর দাদু সম্পন্ন জমিদার ছিলেন, এখন আর সেই সম্পদ, সম্মান নেই।

''বাবার অনুরোধে প্রায় একবছর উনি দিদি আর আমাকে অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। সেই থেকে আলাপ। সেও প্রায় পাঁচবছর আগের কথা। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে এ রাতটা ওখানে থেকে যাব।'' বললাম, ''নতুন দেশ দেখা আর নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় করাই আমার কাজ, দামি হোটেলে থাকার কোনও বাসনাই আমার নেই।''

মাটির ওপর খোয়াপেটানো রাস্তা, দুদিকে ঝোপঝাড়। ফাঁকা প্রান্তরের বুক চিরে রাস্তাটা চলে গেছে। তখনও দশটা বাজেনি, গাড়ি এসে দাঁড়াল গ্রামপ্রান্তের একটা নির্জন জায়গায়। সেখানে কোনও লোকালয় ছিল না। বিশাল একটা প্লট, বড়ো বড়ো গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে জংলিগাছের বেড়া। মাঝখানে মনে হল ভাঙা পুরোনো এক জমিদারবাড়ি।

রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে দাঁড়িয়েছিল সরিতা আর ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে বলল, ''গাড়ি থেকে নেমে এস।''

আমাকে চমকে দিয়ে বিশাল একটা ঘড়ি ঢং ঢং করে দশটার ঘণ্টা বাজাল। আমি এতক্ষণ দেখিনি ভাঙা অট্টালিকার ওপর ওই ঘড়িটা রয়েছে। ঘড়ি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্‌কর্‌ আওয়াজ তুলে লোহার একটা গেট খুলে গেল। দেখলাম, শুভ্রকেশ শুভ্র পোশাকে এক বৃদ্ধ ফুলের মতো ফুটফুটে একটি মেয়ের হাত ধরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। হেঁকে বললেন, ''আহারম্‌ করিক্যাতবর উন্ডাঙ্গিল ওয়ারিকা।'' এইভাবে তিনবার বৃদ্ধ ডাক দিলেন। পরে জেনেছিলাম এর অর্থ: ''কে অভুক্ত রয়েছ, চলে এসো।'' সরিতা সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে দ্রুতপায়ে চলল সেদিকে। বৃদ্ধের হাঁটুতে হাত ছুঁইয়ে নমস্কার করে বলল, ''আম্মাওন—আমি এসেছি।'' বৃদ্ধ দুহাতে সরিতার মুখখানা চেপে ধরে মাথায় চুম্বন করলেন।

সরিতা আমার দিকে ফিরে বলল, ''ইনি আমাদের বন্ধু, কেরালার পটভূমিতে একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসেছেন। আমরা এখন এরনাকুলম থেকে দিদির একটা নাচ দেখে কোভালমে ফিরছিলাম। ওখানে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তাই আজ রাতে ভাবলাম তোমার অতিথি হয়ে যাই। সেই আগের মতো তুমি রাত দশটায় অভুক্তদের খাওয়াবার জন্য ডাক দিয়ে যাচ্ছ!''

বৃদ্ধ সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললেন, ''অতিথি নারায়ণ, এ যে আমাদের প্রাচীন ভারতের শিক্ষা।'' সরিতার বয়সী একটি মেয়ে ঘরের ভেতর

থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটি সম্ভবত একটু বড়ো হবে। সে সরিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ''একেবারে ভুলে গেলি? প্রেমা তো আর খবরই নেয় না।''

—তুল্লি কোথায়?

—ডাইনিং হলে বসে ডিনার করছে।

বৃদ্ধ হরিগণেশন বললেন, ''অনেক রাত হল, অতিথিকে ডাইনিং হলে নিয়ে চলো, যা আছে ভাগ করে খাওয়া যাবে।''

এতক্ষণ আমি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম, এবার এগিয়ে গিয়ে বাঙালি রীতি অনুযায়ী বৃদ্ধের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে উনি ডান হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে চললেন।

ভালোই হল ডিনার। কয়েকরকম পদ ছিল। শেষে পায়সম্ পদটি ভোজসভাটিকে একেবারে জমিয়ে দিল। মধুরেণ সমাপয়েৎ আর কী! খাওয়ার শেষে টেবিলে বসেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প করছিলাম। সরিতা তার দিদির সমবয়সী বান্ধবীটিকে নিয়ে উঠে গেল।

কিছু পরে সরিতা ফিরে এসে বলল, ''চলো, তোমার বিশ্রামের ঘর দেখিয়ে দিই, রাত কম হল না।'' তার সঙ্গে বিরাট প্রাঙ্গণ পেরিয়ে একটি শিরিষ গাছের তলায় গেস্টরুমে পৌঁছালাম।

—এখানে তোমার প্রয়োজনের প্রায় সবকিছু রয়েছে, যদি কিছু দরকার হয় কলিং বেল রয়েছে, সুইচটা টিপে দেবে।

—তুমি এখন এসো, আমার রাতে কিছু দরকার হবে না।

সরিতা চলে গেল। ছিমছাম বাথরুম। হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে নিলাম। এতক্ষণ ভালো করে ঘরখানা দেখিনি, এখন খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। চমৎকার! ধবধবে সাদা চাদর পাতা রয়েছে বিছানায়। সুন্দর লতাফুলের কাজ করা পাশবালিশ আর মাথার বালিশ। পাশে ওভাল শেপের কাচ দেওয়া টেবিল। হালকা সি-গ্রিন রঙের ফুলদানিতে সবুজ পাতার মাঝে হলুদ আর গোলাপি রঙের একগুচ্ছ ফুল। তার নিচে কালো পাথরের একটা থালা। সামান্য জলের ওপর ছড়ানো রয়েছে এক মুঠো মল্লি ফুল (মল্লাপু)। সারা ঘরটাতে মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

কলার দেওয়া মোটা একটা গেঞ্জি পরে নিলাম, রাতে যদি শীত করে। হাওয়া দিচ্ছিল। সবে শুতে যাবার জন্য রুম-স্লিপারটা খুলতে যাচ্ছি, ভেজানো দরজায় কে যেন টোকা দিলে। দরজাটা তখনও বন্ধ করিনি, দ্রুত গিয়ে ভেজানো দরজা খুলে দিলাম। বৃদ্ধের নাতনি এক মুখ হাসি আর এক গ্লাস জল নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

টিপয়ে জলটা রেখে আমার দিকে ফিরে বললেন, ''আমি ললিতা, প্রেমা আর সরিতার বন্ধু।'' বললাম, ''সরিতার কাছে অতি সামান্য শুনেছিলাম আপনার সম্বন্ধে। আমি রঞ্জন, অধ্যাপনা আমার পেশা আর সাহিত্যসৃষ্টি আমার নেশা।'' ললিতা বললেন, ''ইতিমধ্যে আপনার সম্বন্ধে সরিতার কাছ থেকে অনেক কিছু শোনা হয়ে গেছে।'' বললাম, ''সারা ভারত আমি ঘুরে বেড়াই। ছুটি পেলে বাড়িতে বসে থাকতে পারি না। বলতে পারেন, আমার 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এই যেমন বিনা আমন্ত্রণে ঢুকে পড়েছি আপনার সুসজ্জিত গেস্ট হাউসে।''

ললিতা বাধা দিয়ে বলল, ''ওভাবে বলছেন কেন, আপনি তো আমাদের পরম প্রাপ্তি, দাদুর ভাষায়—অতিথি নারায়ণ।''

কথায় কথায় এসে পড়ল ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ। একসময় বললাম, ''অভয় দেন তো একটা কথা জানতে চাই, জানবেন এটা লেখকের কৌতূহল।''

—আপনি অসংকোচে সবকিছু বলতে পারেন।

—আপনার স্বামী কি নিউইয়র্কে সেটল্ করেছেন?

—শুনেছি ওখানে উনি সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছেন।

—ওখানে কি ওঁর বিজনেস?

—উনি ডাক্তার, তাছাড়া এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ছোটো একটা বিজনেসও আছে।

আবার প্রশ্ন করলাম—উনি কি ওখানে নতুন সংসার করেছেন?

—জানতে চাইলে জানতে পারতাম, কিন্তু আমার প্রবৃত্তি হয়নি।

—উনি আপনাকে নিউইয়র্কে নিয়ে যেতে চাননি?

—চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি যেতে চাইনি।

—কারণটা জানতে পারি কি?

মনে হল দারুণ ক্ষুব্ধ আর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ললিতা, ''বলুন তো নিজের দেশ আর আপনজন ছেড়ে কেউ কখনও বিদেশে গিয়ে থাকতে পারে? তাও শুধু অর্থের লোভে!'' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, ''আমার দাদুকে তো দেখলেন। অল্প বয়সে আমি বাবাকে হারাই, দাদুর আশ্রয়েই সেই থেকে আমরা বড়ো হয়ে উঠেছি। লেখাপড়া, সামান্য কাজকর্ম সবই দাদুর দৌলতে। দাদু বলতেন, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঐশ্বর্যের লোভ পাপ। ব্যবসা করতে গেলে তাকে বিপুলভাবে বাড়াতে যাবে না। শেষে সামলানো দায় হবে। কিছু মানুষকে তোমার বিজনেসে যদি যুক্ত করতে পার, সপরিবারে যদি তাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে পার তো তা-ই যথেষ্ট। অনেক বড়ো ব্যবসা সবার জন্য নয়।' আমাদের একটা কয়ারের কারখানা আছে। দুটি ছেলে আর দশটি মেয়ে সেখানে কাজ করে। আমরা সম্ভবমতো যতটুকু দিতে পারি তাতেই তারা খুশি।'' আবার প্রশ্ন করলাম, ''তুল্লির বাবার সঙ্গে আর কোনওরকম যোগাযোগ কি নেই?''

—এখন আর নেই, এখানে তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও কোনওরকম সম্পর্ক রাখি না।

এবার কথার মোড় ঘোরালেন ললিতা, ''যারা ছোটো থেকে মা-বাবা-দাদু-দিদার স্নেহে আর সাহায্যে বড়ো হয়ে উঠল, যে দেশের জল-হাওয়ায় প্রাণ বাঁচল সেই দেশের স্বজন-বন্ধু আর পরিবেশকে ভুলে আমরা কী মোহে বিদেশ-বিভুঁইয়ে চলে যাব? শুধু অর্থ উপার্জন! সবাইকে নিয়ে থাকার আনন্দ, সবার সঙ্গে সুখদুঃখ ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ, এইসব ছেড়ে কোন স্বর্গে যাবার জন্য আমরা পাগল হয়ে উঠব!''

ললিতার কথা শুনে একান্নবর্তী পরিবারের একটা ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল। কিছু সময় কথাবার্তার পর ললিতা আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বন্ধুর কাছে অন্দরমহলে চলে গেলেন।

পরদিন বিছানা ছাড়তে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার, বাইরে শিশুর কলকণ্ঠ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখলাম, তুল্লি আর তার মা উঠোন থেকে দরজা পর্যন্ত পিটুলি নিয়ে আলপনা দিচ্ছে।

বললাম, ''উঠতে বড়ো দেরি হয়ে গেল আজ।''

তুল্লি চেঁচিয়ে বলল, ''এক্ষুনি গেস্ট আসবে তো তাই আলপনা দিচ্ছি।''

আমি আরও বিব্রত হলাম। বললাম, ''সত্যিই এত দেরিতে ওঠা আমার ঠিক হয়নি।'' ভাবলাম, হয়তো কোনও গেস্ট আসবেন, এখানেই তাঁর ওঠার ব্যবস্থা হয়েছে। পরিস্থিতিটা মুহূর্তে বুঝে নিলেন বুদ্ধিমতী ললিতা। পায়ে পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ''এ অতিথি আপনার আমার মতো মানুষ নয়, সংখ্যায় ওরা অনেকেই। আলপনার চালের গুঁড়ো খেতে এখুনিই সারি দিয়ে আসবে অতিথিরা।''

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ''পিঁপড়ে?''

ললিতা বললেন, ''দাদু তুল্লিকে শিখিয়েছেন, অতিথি নারায়ণ, পিঁপড়েটিও নারায়ণ, সাধ্যমতো নারায়ণের সেবা করতে হয়।''

গ্রামপ্রান্তের সেই কুটিরে আমি সারা ভারতবর্ষের অতিথিপরায়ণতার একটি সার্থক ছবি দেখতে পেলাম।